রক্তকরবীর নানাকথা

সংকলন ও সম্পাদনা সৌমিত্র কুমার চ্যাটার্জী

RAKTAKARABIR NANAKATHA
Collection, Edited & Published by : Soumitra Kumar Chatterjee
Natya Katha Prakashan Bibhag

প্রথম প্রকাশ : ১লা জুলাই ২০১৫

© শরণ্যা চ্যাটার্জী

ISBN : 978-81-931050-1-6

প্রচ্ছদ : সৌমিত্রকুমার চ্যাটার্জী
নামাঙ্কন : দেবাশিস বিশ্বাস

নাট্যকথা প্রকাশন বিভাগের পক্ষে সৌমিত্রকুমার চ্যাটার্জী কর্তৃক 'অনিলা' ২১/ই এম. এম. ফিডার রোড আড়িয়াদহ কলকাতা-৫৭ থেকে প্রকাশিত এবং তনুশ্রী প্রিন্টার্স ২১বি, রাধানাথ বোস লেন কলকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত। যোগাযোগ : ৯০৫১১১১৭২৪/৯৮৮৩৩৮৮৩৫৮

মূল্য : ৩০০ টাকা

পাঠক্রম

পর্ব এক
বিষয় : রক্তকরবী

রক্তকরবী : তত্ত্ব রসভাষ্যে ভাবকল্প
ড. অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ১৭

রক্তকরবীর পুরাণ-অনুষঙ্গ
শিপ্রা গাঙ্গুলী (চক্রবর্ত্তী) ৫৩

রক্তকরবী ঃ প্রসঙ্গ মিথকথা
শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৭

রক্তকরবীর নেপথ্য ভাবনা
ড. দীপঙ্কর ভট্টাচার্য ৬১

রক্তকরবী নাটকের প্রথম খসড়া
মধুমিতা বসুচক্রবর্তী ৬৬

রক্তকরবী নামকরণ যথাযথ
রুবী চট্টোপাধ্যায় ৬৮

রূপক-সাংকেতিক নাটক—রক্তকরবী
ড. সোমালি কুণ্ডু ৭০

রক্তকরবী : নাট্যগঠন
প্রণবকুমার দা ৮২

"রক্তকরবী" নাটকে রং-এর ব্যবহার
লক্ষ্মীকান্ত মান্না ৯৩

"রক্তকরবী" : গান : প্রাসঙ্গিকতা এবং প্রতিবাদী ভাবনা
চিত্রা মণ্ডল ৯৭

'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে'...
সেক আপতার হোসেন ১০৮

রক্তকরবী ঃ গানে গানে
উদয় সরদার ১১৩

"রক্তকরবী" নাটকের চিত্রকল্প ঃ নাট্যদ্বন্দ্বের যথার্থ উদ্ভাসন
দেবরাজ হাওলাদার ১২০

‘পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে’...

সেক আপতার হোসেন

আধুনিক সভ্যতার অন্যতম উপাদান প্রযুক্তি তথা যন্ত্র। মানব সমাজকে সহজ সরল ও উন্নততর নির্মাণে যন্ত্র সভ্যতা নানা ভাবে সাহায্য করেছে। তাই মানুষ ক্রমে ভক্ত হয়ে উঠেছে যন্ত্র সভ্যতা তথা শিল্প সভ্যতা। এবং তা হতে গিয়ে মানুষ কৃষি সভ্যতা তথা প্রাকৃতিক জীবনাচরণ থেকে সরে এসেছে। এই বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার জীবন ও শাসন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে জীবনের সহজ ছন্দ, সরল গতিবেগ। তবে রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রের বিরোধী নন, তিনি তখনই বিরোধীতা করেন, যখন যন্ত্র মানব সভ্যতার বিরোধী হয়ে ওঠে। ‘মুক্তধারা নাটকে যেমন তিনি যন্ত্রের বাঁধকে ভেঙে দিয়ে জলের তথা জীবনের ধারাকে অব্যাহত রাখেন তেমনি ‘রক্তকরবী’ নাটকে স্বর্ণের পিঞ্জর থেকে তথা শিল্প সভ্যতার করাল গ্রাস থেকে তথা ‘দশ-পঁচিশের ছক’ থেকে প্রাণের ধারাকে বের করে আনেন। কারণ তিনি এখন মাটির পৃথিবীর দিকে চোখ ফিরিয়েছেন। প্রকৃতির অকৃত্রিম ভালবাসায় একাত্ম হয়ে যাওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছেন। তাই এ নাটকে মানব সভ্যতার মূল ভিত কৃষি সভ্যতার দিকে এগিয়ে গিয়েছে। তাই এ নাটকে বার বার ধ্বনিত হয়েছে–

‘পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে–আয় রে চলে,
আয় আয় আয়।
ডালা যে তার ভরেছ পাকা ফসলে,
মরি, হায় হায় হায়।

রাবীন্দ্রিক দর্শনের মূল কথা পূর্ণ জীবন ভাবনা। কিন্তু বাস্তব সমাজে মানুষ নানা ভাবে খণ্ডিত। কারা তারা নানা ভাবে আবদ্ধ। এই আবদ্ধ জীবনে মুক্তির স্রোত বয়ে এসেছে সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথ একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়ে ছিলেন–

‘অচলায়তনে আমি শুধু গোঁড়া রিচুয়োলিজম, প্রাণহীন, অর্থহীন, ফর্মস এর বিরুদ্ধে যে দন্ডায়মান হইয়াছি, এ কথা মনে করিবেন না। আপনি

দেখিবেন মহাপঞ্চককে আমি কখনই ঘৃণার চক্ষে দেখি নাই। আমার মনে হয় সে যেন একটা প্রকাণ্ড কলের চাকার মতো শূন্যে ঘুরিতেছে। এক ইঞ্চিও অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, অথচ এই যে অবিশ্রান্ত ঘূর্ণন, এই তাহার জীবনের একমাত্র কাজ। মহাপণ্ডিত মহাপঞ্চককে একবার বাহিরের জীবন স্রোতে আনিয়া দিন, একবার বাহিরের আলো বাহিরের বাতাস, তাহাকে স্পর্শ করুক, তাহার চারিদিকের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দিন, দেখিবেন সে আবার সেই খানেই নূতন ভাবে বিভোর হইয়া নেতৃত্ব করিতে পারিবে, তাহার নিকট হইতেই বেশি কাজ পাওয়া যাইবে। সে এতদিন নিজেকে চিনিতেই পারে নাই। আজ তাহার বিশ্বের সহিত এই নূতন পরিচয় সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেছে, সে আজ-নিজেকে চিনিতে পারিতেছে, সে যে শুধু একটা কল নয়, শুধু শূন্যে ঘূর্ণমান একটা চাকা নয়, আজ তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছে। এখন সমগ্র মানব সমাজের সহিত তাহার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া গিয়াছে, সে মুক্তির আনন্দ অনুভব করিতেছে।'

('সুপ্রভাত' পত্রিকা ১৩১৮ বঙ্গাব্দ)

রক্তকরবীর বিষয় আলাদা হলেও এর চরিত্রগুলি মহাপঞ্চকের মতই নানা ভাবে নানা দিক দিয়ে আবদ্ধ। তাল তাল সোনা তুলতে গিয়ে তলিয়ে গিয়েছে তাদের সহজ জীবন বোধ। মানব রূপ ধারণ করেও তারা ক্রমে যন্ত্র হয়ে উঠেছে। গল্প থেকে তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। কিশোর চরিত্র জানায়—'সমস্ত দিন তো কেবল সোনার তাল খুঁড়ে আনি, তার মধ্যে একটু সময় চুরি করে তোর জন্যে ফুল খুঁজে আনতে পারলে বেঁচে যাই।' অধ্যাপক জানায়—'মানুষের অনেকখানি বাদ দিয়ে পাণ্ডিত্যটুকু জেগে আছে।' একই সুরে বিশু জানায়—'আমি ৬৯ঙ। গাঁয়ে ছিলুম মানু, এখানে হয়েছি দশ-পঁচিশের ছক।' আর এ নাটকের প্রদানর চরিত্র রাজা জানায়—

'আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি—তোমার মতো একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি, আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত।"

তাই যক্ষপুরী নামক নরকপুরী থেকে খণ্ডিত মানুষকে সম্পূর্ণতায় ফিরিয়ে আনার কাজ করেছে নন্দিনী ও নন্দিনীর গান। লক্ষণীয় নন্দিনী কোনো বাইরের সত্তা নয়। যক্ষপুরীর রাজারই অন্তর-সত্তা। সে তাল তাল সোনার ভাণ্ডারে নিজেকে নিঃশেষ করে দিলেও তার মধ্যেও বর্তমান ছিল একটি প্রাণের সত্তা। তাই নিজের প্রাণ সত্তাকে জাগাবার জন্য রাজা নন্দিনীকে এনেছে। কিন্তু আবদ্ধ যক্ষপুরীতে প্রাণের প্রকৃতিকে বিসর্জন দিতে নারাজ নন্দিনী। সেই তাই মুক্ত পৃথিবীতে রাজাকে আমন্ত্রণ জানায় তার গানের মধ্যে। এরপর রাজার মধ্যে শুরু হয় যুদ্ধ। নিজেকে হারিয়ে নিজেকে পাওয়ার যুদ্ধ।

রক্তকরবী নাটকে যে গানগুলি ব্যবহার করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে মাটির পৃথিবীর প্রতি তথা অকৃত্রিম প্রকৃতির প্রতি ফিরে চলার ডাক। আবদ্ধ জীবন থেকে বেরিয়ে

আসার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ। সেইসঙ্গে রয়েছে প্রকৃতির ভালবাসাময় ডাক ও প্রেমের গান, এর মধ্যে রয়েছে মুক্ত পৃথিবীর সঙ্গে একাত্ম হওয়ার আহ্বান।

এ নাটকের প্রথম ও শেষ গান–

'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে–আয়রে চলে,
আয় আয় আয়।'

–এখানে রয়েছে প্রকৃতির ডাক।

আবদ্ধ যক্ষপুরি থেকে মুক্ত পৃথিবীতে বেরিয়ে আসার ডাক। কেবল আহ্বান নয়, প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা তৈরির জন্য প্রকৃতির উদারতার পরিচয়ও রয়েছে।

'ডালা–যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি, হায় হায় হায়।'

–এখানে প্রকৃতির দানের কথা রয়েছে।

–এরপর রয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মা হওয়ার পরিচয়–

'হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে
দিগ্‌বধূরা ধানের খেতে,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে–
মরি, হায় হায় হায়।

–এখানে 'দিগ্ বধূরা' তথা মানব জগৎ যেমন প্রকৃতিকে ভালোবেসেছে, তেমনি প্রকৃতিও তার ভালোবাসার প্রকাশ ঘটিয়েছে 'মাটির আঁচলে'। এই ভালোবাসার শান্তির পৃথিবী মানব জীবনের চির আকাঙ্খিত জগৎ। তাই নন্দিনী রাজাকে জানায়–

'তুমিও বেরিয়ে এসো রাজা, তোমাকে মাটে নিয়ে যাই।'

এরপর গানের অংশ–

'মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হল–
ঘরেতে আজ কে রবে গো। খোলো দুয়ার খোল।'

–এরপর সম্পূর্ণ নাটক জুড়ে রাজার দুয়ার খুলে বেরিয়ে আশার প্রক্রিয়াই বাস্তবায়িত হতে দেখা যায়। রাজাকে এক সময় বলতে শোনা যায়–

'সুন্দরের জবাব সুন্দরই পায়। অসুন্দর যখন জবাব ছিনিয়ে নিতে চায়, বীণার তার বাজে না, ছিঁড়ে যায়।'

রাজা জানে সুন্দর একাত্ম হলে গেলে তাকেও যোগ্য হতে হবে। তখন তাল তাল সোনায় আবদ্ধ জীবনকে ভাঙতে হবে। না হলে সুন্দরকে আপন করা সম্ভব নয়।

–ক্রমে রাজার চেতনার জাগরণ ঘটেছে। অন্য একটি উক্তিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়–

"এই ব্যাঙ একদিন একটা পাথরের কোটরের মধ্যে ঢুকেছিল। তারই আড়ালে তিন হাজার বছর ছিল টিকে। এইভাবে কী করে টিকে থাকতে হয় তারি রহস্য ওর কাছ থেকে শিখছিলুম; কী করে বেঁচে থাকতে হয়

তা ও জানে না। আজ আর ভালো লাগলো না, পাথরের আড়াল ভেঙে ফেললুম; নিরন্তর টিকে-থাকার থেকে ওকে দিলুম মুক্তি।'

–এ মুক্তি কেবল একটি ব্যাঙের মুক্তি নয়। এখানে অবচেতন সত্তা তথা প্রাণ সত্তার মুক্তি ঘটছে। তাই ব্যাঙ উদ্ধার আসলে নিজেকে উদ্ধারের একটি মনস্তাত্ত্বিক পদক্ষেপ। এভাবে কেবল রাজা নয় অন্য চরিত্রগুলিও চির কাঙ্ক্ষিত মুক্তির স্বাদ পেতে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। এই চরম মুহূর্তের রূপ দিতে নাটকের অন্য গানগুলিও সহায়তা করেছে।

বিশুর 'মোর স্বপন তরীর কে তুই নেয়ে' গানটির মধ্যে নিজেকে ভেঙে আবার নতুন করে গড়ার কথা বলা হয়েছে। 'তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে গেল ওরে' গানটির মধ্যে বর্তমানের বাঁচা থেকে মরণ যে দৃঢ়তম তা বোঝানো হয়েছে। এই অসাড় হয়ে বেঁচে থাকার অপ্রাসঙ্গিকতা বোঝাতে গিয়ে, নতুন ভাবে বাঁচার প্রয়াস সৃষ্টি করা হয়েছে।

'তোমার গান শোনাব তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ' গানটি প্রেমের গান হলে বাইরের স্বাভাবিক প্রকৃতি জগৎ ও অন্তরে অস্বাভাবিক মানব জগতের পার্থক্য দেখানো হয়েছে। এর পর 'আমার কাজের মাঝে' গানটির মধ্যে জীবনকে নতুন করে ভাবার একটা পরিবেশে সৃষ্টি করেছে। ক্রমে বিশুর 'ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার দুখের পারাবারে' গানটির মধ্যে বদ্ধ জীবনকে ভেঙে মুক্ত জীবন গড়ার ইতিহাস ব্যক্ত হয়েছে। এই স্মৃতি চারণ পুনরায় মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে দৃঢ়তা দিয়েছিল। এরপর রাজার মনে যখন বদ্ধজীবন থেকে বেরিয়ে আসার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হচ্ছে। তখন রাজা জানায়–

'মরণের মাধুর্য আর কখনো এমন করে ভাবিনি। সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কালো চুলের নিচে মুখ ঢেকে ঘুমোতে ভারি ইচ্ছে করছে'।

–এখানে রয়েছে স্বতস্ফূর্ততার প্রকাশ। অহংকারী বস্তুজগতের কাছে 'ইচ্ছে'র জারণ ঘটেছে।

এর পরেই নন্দিনীর 'ভালোবাসি ভালোবাসি' গানে প্রকৃতির উপর মানবসত্তা আরোপিত করে অবচেতন সত্তা ও স্মৃতি সত্তার জাগরণ ঘটিয়ে রাজার মনের পরিবর্তন সাধন করার চেষ্টা রয়েছে। যেখানে ধরা দিতে এসেছে–

'ভুলে যাওয়া গানের বাণী, ভোলা দিনের কাঁদন হাসি।'

–এরপর বিশুর পথ চাওয়ার গান–'যুগে যুগে বুঝি আমার চেয়েছিল যে।' এখানে যেমন প্রেমিকের জন্য পথ চেয়ে বসে থাকার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে তেমনি অবচেতনে মুক্ত পৃথিবীর প্রতি আকর্ষণ ও দেখা দিয়েছে। তাই বিশুর শেষ গান–"শেষ ফলনের ফসল এবার / কেটে লও, বাঁধো আঁটি'। গানটির মধ্যে মাটিতে ফিরে আসার শেষ প্রচেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে।

নাটকের শেষে দেখতে পাই–রাজা তার স্বর্ণপুরিকে ভেঙে মাটির পৃথিবীতে নেমে এসেছেন। রাজার কথায়–

'বুঝতে পারছ না? সেই লড়াই শুরু হয়েছে।

–এই আমার ধ্বজা, আমি ভেঙে ফেলি ওর দণ্ড, তুমি ছিঁড়ে ফেলো ওর কেতন। আমারি

হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক, সম্পূর্ণ মারুক—তাতেই আমার মুক্তি।'

এমনসময় আবহ সংগীতের মত শোনা গিয়েছে 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' গানটিকে।

সুতরাং সমগ্র নাটকের গতিপথ লক্ষ্য করলে দেখা যায় আবদ্ধ বা খণ্ডিত মানব জীবন থেকে বেরিয়ে পূর্ণ মানব জীবনে প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। এবং তা রূপ দিতে 'পোষ তোদের ডাক দিয়েছে' গানটি প্রধান উদ্ধার কর্তা হিসেবে কাজ করেছে এবং বাকি গানগুলি তার অঙ্গিরস হিসেবে ভিত্তিভূমির প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।